# নিরাপদ খাদ্য

প্রফেসর তামান্না সরকার

মানুষের বেঁচে থাকার অন্যতম মৌলিক চাহিদা হলো খাদ্য। মূলত আমাদের অস্তিত্ব খাদ্যের উপর নির্ভরশীল। সাধারণত যেসব আহার্য জীবদেহের বৃদ্ধি, শক্তি উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ এবং ক্ষয়পূরণ করে অর্থাৎ দেহের পুষ্টি সাধন করে তাকে খাদ্য বলে। দেহের কাজকর্ম সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত করে দেহকে সুস্থ ও কাজের উপযোগী রাখার জন্য যে সকল উপাদান প্রয়োজন, সেসব উপাদানই খাদ্য।খাদ্যের নিরাপদতা হলো এক বা একাধিক পদক্ষেপ যা ভোক্তার স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য খাদ্যকে বিভিন্ন দূষক বা বিপত্তি যেমন: ভৌত দ্রব্য, অনুজীব (ব্যাকটেরিয়া/ভাইরাস), রাসায়নিক দ্রব্য ও অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী উপাদান থেকে রক্ষা করে। খাদ্যকে দূষিত করতে পারে তথা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক খাদ্যহিত যে-কোনো কিছুকে বাদাবিপত্তি বলা হয়।তাই সুস্থ সবল জাতি গড়তে খাদ্যের নিরাপদতা ও পুষ্টি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।  খাদ্য সংশ্লিষ্ট বিপত্তি নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে খাদ্যের সাথে সংশ্লিষ্টদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ২৫(১) ধারায় প্রত্যেক মানুষের খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ আছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) ও ১৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য খাদ্যের মৌলিক চাহিদা পূরণ আবশ্যক। ০৩ জুন ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সম্মেলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে ১৯৯৬ সালের বিশ্ব খাদ্য শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত সংজ্ঞা অনুযায়ী সকল সময়ে সকল নাগরিকের কর্মক্ষম ও সুস্থ জীবনযাপনে প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। ২০০০ সালে বাংলাদেশের জন্য একটি সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা সুসংহত করা শুরু হয়। বিগত দশকে বাংলাদেশে খাদ্য ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে, যেখানে দারিদ্র্যপীড়িত ও দুস্থ পরিবারসমূহের জন্য চাল ও গমের সহজলভ্যতা সৃষ্টি, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পুষ্টিকর নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তবে নিরাপদ ও পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য নিশ্চিত করা এখন  নতুন চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জনগণের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার আবশ্যকতা বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। সেই সাথে উক্ত আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ২০১৫ সালের ০২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়। কর্তৃপক্ষের প্রধান কাজ হলো বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন এবং বিক্রয় প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা। কর্তৃপক্ষ তাদের কার্যক্রম সার্বিকভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বেশ কিছু বিধি-প্রবিধানমালা প্রণয়ন করেছে। দক্ষ ও সতর্ক হাতে খাদ্য তৈরির উপর খাদ্যের নিরাপদতা ও পুষ্টিগুণ বহুলাংশে নির্ভর করে। খাদ্যের নিরাপদতা একটি বহুমাত্রিক বিষয়। তাই খাদ্য ক্রয়, প্রস্তুত, রান্না, পরিবেশন ও সংরক্ষণের প্রতিটি ধাপে খাদ্য কিভাবে নিরাপদ রাখা যায় সে বিষয়ে পারিবারিক পর্যায়ে সকলের ধারণা থাকতে হবে। খাদ্যের বিভিন্ন বিপত্তি (Hazard) সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখা এবং এগুলো নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখা সকলের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ দূষিত খাবার খেয়ে রোগাক্রান্ত হচ্ছে এবং তাদের অনেকেই গুরুতর অসুস্থ হচ্ছে। কেউ কেউ আবার সারা জীবনের জন্য রোগাক্রান্ত হচ্ছে এবং বংশ পরম্পরায় আক্রান্ত হচ্ছে। খাদ্যবাহিত রোগে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, গর্ভবতী ও প্রসূতি মহিলা এবং যারা আগে থেকেই অন্য কোনো কারণে অসুস্থ। অনিরাপদ খাদ্যের লক্ষণ হলো দূষণের চূড়ান্ত পর্যায়ে খাবারের রং, গন্ধ, গঠন (texture) পরিবর্তন দ্বারা খাবারের অনিরাপদতা বুঝা যায়। খাদ্য অনিরাপদ হওয়ার কারণ হলো রাসায়নিক ও এনজাইমজনিত গঠনগত কারণে বাইরের আর্দ্রতা, আলো, তাপ, জীবাণু, অক্সিজেন প্রভৃতির প্রভাবে পচনে সহায়তাকারী ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট, মোল্ড ও ভাইরাসের মত অণুজীব (Microorganism) এর সংক্রমণে  ডিম ও দুধ, ইত্যাদি খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে, যা থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যবাহিত রোগ তৈরি হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

প্রাকৃতিক এবং আমাদের অভ্যাসগত ও অসাবধানতাজনিত কারণেও খাদ্য অনিরাপদ হয়। উৎপাদন ও প্রস্তুত পর্যায়েও দুষণের কারণে খাদ্য অনিরাপদ হতে পারে। সাধারণত ৪টি উপায়ে খাদ্য  অনিরাপদ হয়: ভৌত – ধুলা-ময়লা, চুল, পাথর কণা ও আর্বজনা, ইত্যাদির উপস্থিতিতে, রাসায়নিক —মানব স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ (যেমন: কীটনা এন্টিবায়োটিক, সংরক্ষণ দ্রব্যের

মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার, আর্সেনিক, সীসা ইত্যাদি)-এর মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতিতে , জৈবিক —ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক ও অন্যান্য জীবাণুর উপস্থিতির ফলে; এবং  অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী –কিছু কিছু পদার্থ যেমন: গ্লুটেন, ল্যাকটোজ ইত্যাদির উপস্থিতির কারণে।

বাজার করার সময় পচনশীল দ্রব্য যেমন: দুধ, ডিম, মাছ, মাংস বা অন্য হিমায়িত খাবার সবশেষে কিনতে হবে, অন্যথায় খাবার নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি থাকে। রেফ্রিজারেটরে রাখার উপযোগী খাবার কেনার পর দ্রুত বাড়িতে এনে জরুরি ভিত্তিতে রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজারে রাখতে হবে। যদি মোড়কের গায়ে 'রেফ্রিজারেটরে রাখুন বা 'ফ্রিজারে রাখুন' অথবা 'ঠান্ডায় রাখুন' এরূপ লেখা থাকে সেক্ষেত্রে খাবার কেনার আগে খাবারটি যথাযথভাবে হিমায়িত করা আছে কিনা দেখে নিতে হবে।

খাদ্য বাছাই ও ক্রয়কালে করণীয় ও বর্জনীয়:মোড়কজাত চাল, ডাল, আটা ও ময়দা ক্রয়ের সময় উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ বা সর্বোত্তম ব্যবহারের তারিখ দেখা;  মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের (বিএসটিআই) অনুমোদিত সিল দেখে ক্রয় করা।বিশ্বস্ত ও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্যাকেটজাতকৃত দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য ক্রয় করা;সম্ভব হলে ঘরে দই তৈরি করতে হবে। প্যাকেটজাত দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য কেনার সময় সর্বোত্তম ব্যবহারের তারিখ দেখে নিতে হবে। মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের (বিএসটিআই) অনুমোদিত সিল দেখে ক্রয় করা। মোড়কের গায়ে সুস্পষ্টভাবে উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ ও সর্বোত্তম ব্যবহারের তারিখ উল্লেখ না থাকলে মেয়াদ উত্তীর্ণ দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য ক্রয় না করা।স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত, তাজা, মৌসুমি, পরিপক্ক ফলমূল ও শাকসবজি ক্রয় করা।ঝরঝরে, সতেজ, সবুজ অথবা রঙিন শাকসবজি ক্রয় করা। ফল ক্রয় করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে ফলসমূহ শক্ত, তাজা, নিখুঁত ও পরিষ্কার কিনা; যথাসম্ভব রসালো ফল ক্রয় করা। অতি পাকা, গলা, কালো দাগযুক্ত, থেতলানো বা পোকাযুক্ত ফল ও সবজি ক্রয় না করা।পরিষ্কার ও নিখুঁত খোসাযুক্ত ডিম ক্রয় করা। বিবর্ণ ও নোংরা বা ময়লা খোসাযুক্ত ডিম ক্রয় না করা।

খাবার নিরাপদে রাখার কয়েকটি কৌশল হলো খাবার আর্দ্রতা থেকে দূরে শুকনো অবস্থায় রাখা।নন-ফুড গ্রেড প্লাস্টিকের পাত্রে খাবার না রাখা ।সম্ভব হলে কাঁচের জার বা বয়াম বা পাত্র ব্যবহার করা; খাবার রাখার জায়গা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে পরিষ্কার রাখা, খাবার নয় এরূপ পণ্য (যেমন: ধোয়া-মোছার সামগ্রী, ওয়াশিং পাউডার, সাবান, ডিটারজেন্ট ইত্যাদি) খাবার থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা।

সরকার ইতিমধ্যে জনগনের খাদ্য নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নানামূখি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। নিরাপদ খাবার নিশ্চিত করার মাধ্যমে পরিবার ও সমাজকে সুস্থ রাখতে ৫টি গুরত্বপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে।এগুলো হলো: খাবার প্রস্তুত করার জায়গা পরিষ্কার রাখা, কাঁচা খাবার ও রান্না করা খাবার পৃথকভাবে রাখা, খাবার ভালোমত রান্না করা,নিরাপদ ও যথাযথ তাপমাত্রায় খাবার সংরক্ষণ করা এবং খাদ্য প্রস্তুতে নিরাপদ পানি ও কাঁচামাল ব্যবহার করা।অনিরাপদ খাবার খাওয়ার কারণে প্রতি বছর প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ মারা যায়, যার মধ্যে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর সংখ্যা ১ লাখেরও বেশি । যা অনিরাপদ, যা খেলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে- সেটি তো খাদ্য নয়। অসৎ মানুষ খাদ্যকে অনিরাপদ করে তুলেছে।তাই সবাইকে সচেতন হতে হবে। প্রয়োজনীয় পুষ্টির নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা না গেলে কোনো উন্নয়নই টেকসই হবে না।

#

পিআইডি ফিচার